হিউম্যানিজম ও হিউম্যান রাইটস

আড়ালে থাকা সত্য

আব্দুল্লাহ বিন বশির
শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.
পাঠানটুলি, নারায়নগঞ্জ

বর্তমানে পুরো মুসলিম-বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে এক ব্যাপক পরিবর্তনের যুগসন্ধিক্ষণে। পৃথিবীর সর্বত্র চলছে ইসলামি মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। যুবসমাজকে দীন থেকে দূরে সরিয়ে কুফরি চিন্তা-চেতনা ও ধর্মহীন আকিদা-বিশ্বাসের তীহপ্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এমন সব আইনকে, যা মুসলিম সমাজের পুরো অবকাঠামোকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

পরিবর্তনের এই ধারা সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে। সে সময় কুফরি বিশ্বাস ও মতবাদসমূহের প্রবল জোয়ার ইউরোপীয় সমাজকে স্বাধীন-সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ জায়গাটি আমাদের ভালোভাবে বোঝা দরকার—ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা ও খ্রিষ্টান ধর্ম কীভাবে কুফরি মতবাদসমূহের সামনে ধ্বসে পড়লো? বর্তমানে পুরো পৃথিবীর ওপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠাকারী পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে সেকালের কুফরি মতবাদগুলোর কী মিল? কীভাবে আধুনিক সভ্যতা মুসলিম বিশ্বকে মোহগ্রস্ত করছে এবং ইসলামি সমাজব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে?

পশ্চিমা সভ্যতার ধ্যান-ধারণা—সেক্যুলারিজম, লিবারেলিজম ইত্যাদি—একসময় সমাজের কিছু এলিট ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মাঝেই আলোচিত ছিল। এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবও তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু আধুনিক যোগাযোগ-ব্যবস্থার কল্যাণে আজ তা ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। ফলে ধর্মকে কেবল অস্বীকারই নয়, বরং ধর্মীয় বিভিন্ন স্থাপনা ও বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে হাসিঠাট্টা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে! ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলো এক এক

করে জনজীবন থেকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে। হিউম্যান রাইটসকে সর্বজনীন ও আধুনিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করে ফেলা হয়েছে। এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক দর্শনগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ! সামান্য কিছু সমালোচনা ও পর্যালোচনা যা হয়েছে তা-ও নিতান্ত দুর্বল ও অগভীর। যেমন : পশ্চিমা বিশ্বে আজ বেহায়াপনা চরম মাত্রায় বেড়ে গেছে, পরিবারব্যবস্থা ধসে পড়েছে, নীতি-নৈতিকতা শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেছে; অতএব আমাদের মুসলিমদের সতর্ক ও সচেতন হতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি! কিন্তু এসবের পেছনে কী আছে? কেন এবং কীভাবে ঘটল এসব বিপর্যয়? মনুষ্য স্বভাববিরুদ্ধ এসব নোংরামিকে কেন পশ্চিমারা আইন বানিয়ে বৈধতা দিয়ে গ্রহণ করে নিল?

সমাজ পরিবর্তনের পটভূমি

সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধের মাঝে পরিবর্তন ঘটার আগে বিবর্তন ঘটে সমাজ-সদস্যদের চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসে। তারপর সেই চিন্তা-বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির কথা ও কাজে। যার বিশ্বাস যতটা দৃঢ়, বিশুদ্ধ ও ওহিয়ে ইলাহির অনুগামী; তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কর্ম ততটা পবিত্র, স্বচ্ছ ও নির্মল। এমন ব্যক্তি থেকেই প্রকাশ পেতে পারে এমন সব কথা ও কাজ, যা সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। আর যার বিশ্বাস যতটা ধোঁয়াশাপূর্ণ এবং ওহিয়ে ইলাহি থেকে যতটা দূরে; তার চরিত্র, কথা ও কাজ ততটাই বিকৃত, বিক্ষিপ্ত ও বিকারগ্রস্ত। এমন লোক থেকে এমন সব কাজই প্রকাশিত হবে, যা সমাজকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় ভরে দেবে।

রেনেসাঁ, রিফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় জনগণের আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মাঝে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। রেনেসাঁর সময় তাদের চিন্তা-বিশ্বাসে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি ঘটে তা হলো, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কোনো ক্ষেত্রেই মানুষ সৃষ্টিকর্তা বা অন্য কারও মুখাপেক্ষী নয়; সর্বক্ষেত্রেই সে স্বাধীন, পরিপূর্ণ স্বাধীন। নানান চড়াই-উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই দর্শন সামনে এগিয়ে যায়। অবশেষে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মাধ্যমে তা পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করে এবং এর নাম হয় হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ; আর এই দর্শনের বাহকের নাম হয় হিউম্যান বিয়িং।

কান্ট : এনলাইটেনমেন্টের প্রধানতম দার্শনিক

ইমানুয়েল কান্ট এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃত। ১৭৮৪ সালে সে What Is Enlightenment? নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা করে, যা ইউরোপের চিন্তাজগতে গভীর প্রভাব ফেলে। মানুষের সত্তা সম্পর্কে কান্টের বক্তব্য হলো, তার মাঝে এমন মৌলিক উপাদান (জাওহার) রয়েছে যা ব্যবহার করে স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে উঠে যেকোনো জিনিসের প্রকৃত বাস্তবতা তার পক্ষে জানা সম্ভব। কান্টের মতে ওই মৌলিক উপাদানকে কাজে লাগিয়ে মানুষের পক্ষে এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা অসম্ভব নয়, যা একই সাথে ১. পূর্ণাঙ্গ (Absolute), ২. সুনিশ্চিত (Certain) ও ৩. সর্বজনীন (Universel)। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে অন্য কারও দ্বারস্থ হওয়া ছাড়াই প্রত্যেক সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবন পরিচালনার জন্য যথাযথ ও কার্যকর নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব।

কান্টের মতে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের (অর্থাৎ ওহির শিক্ষার) সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো, সে মানুষের স্বায়ত্তশাসনকে (Human Autonomy) খোদার অনুগত বানিয়ে ফেলে, অথচ এই স্বায়ত্তশাসন মনুষ্যজাতির মৌলিক উপাদান।

কে আলোকিত?

কান্টের লেখাজোখা পড়লে এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়নের একটি স্পষ্ট ধারণা সামনে আসে। তার মতে, মানুষ যখন নিজ আকলকে কোনো শক্তির অনুগামী না করে নিজে ব্যবহার করে, তখন সে আলোকিত। সে লেখে :

Enlightenment Is man's emergence from his self-imposed immaturity. Immaturity is the inability to use one's understanding with out guidance from another this immaturity is self-imposed when its cause lise not in lack of understanding but in lack of resolve and courage to use it without guidance from another.

মানুষ নিজ বিবেকের ওপর যে অপরিপক্বতা চাপিয়ে রেখেছিলো তা থেকে মুক্তির নামই এনলাইনটেনমেন্ট। অপরিপক্বতা হলো অন্যের দিক-নির্দেশনা ছাড়া নিজ বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে না পারা। এর কারণ এটা নয় যে, মানুষের বোধবুদ্ধি নেই; বরং এর কারণ হলো, অন্যের দিকনির্দেশনা ছাড়া বোধবুদ্ধি ব্যবহারের সৎ-সাহস ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি না থাকা।

কান্টের মতে যুক্তির সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারই মানুষের মেধা ও ইচ্ছাশক্তিকে অপরিপক্ব থেকে পরিপক্ব (অর্থাৎ নাবালেগ থেকে বালেগে পরিণত) করতে পারে। এই দর্শন মানুষের আকল-বুদ্ধি ছাড়া জ্ঞানের অন্য সকল মাধ্যমকে (External Authority) অস্বীকার করে।

এনলাইটেনমেন্টের পরিচয়

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে এনলাইটেনমেন্ট হলো, মানুষের খোদায়িত্বের ওপর ইমান আনা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সত্যকে জানার জন্য ওহির কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজ শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করেই যেকোনো বিষয় জানতে সক্ষম।

হিউম্যানিটি : এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মৌলিক দর্শন

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মৌলিক দর্শনই হলো হিউম্যানিটি। কান্টের মতে, হিউম্যান বিয়িংয়ের মূল বৈশিষ্ট্য হলো স্বায়ত্তশাসন (Autonomy)। অর্থাৎ সে নিজেই নিজের মালিক; যা ইচ্ছা তা-ই সে করতে পারে। কল্যাণ-অকল্যাণের মাপকাঠি নির্ধারণের ক্ষমতাও একমাত্র তার। আর স্বাধীনতা তার মৌলিক অধিকার।

ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসফির ভাষ্যমতে, 'হিউম্যানিজম হলো প্রত্যেক ওই দর্শন, যা মানবীয় মান-মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে এবং মানুষকে সবকিছুর মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করে।'

ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজনে হিউম্যানিজম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এটি এমন এক দার্শনিক প্রবণতার ধারণা প্রদান করে, যা মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণকেই যেকোনো দর্শনের প্রধান কেন্দ্র ও মূল সূত্র

হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তার চিন্তা-জ্ঞানকেই সবকিছুর জন্য যথেষ্ট বলে পীড়াপীড়ি (الإصرار) করতে থাকে।'

আমেরিকান দার্শনিক কর্লিস ল্যামন্ট তার প্রসিদ্ধ বই Humanism as a philosophy-তে হিউম্যানিজম নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। এতে হিউম্যানিজমের দশটি মৌলিক নুকতা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটির মূলপাঠ মর্মানুবাদসহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

First, Humanism believes in a natauralistic metaphysics or attitude toward the universe that considers oll forms of the supernatural as myth; that regards Nature as the totality of being and as a constantly changing system of matter and energy which exists independently of any mind or consciousness.

প্রথম : হিউম্যানিজম প্রাকৃতিক অধিবিদ্যায় বিশ্বাস করে, যা অতিপ্রাকৃত এমন সবকিছুকে মানুষের তৈরি কল্পকাহিনি মনে করে। (যেমন : আল্লাহ, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।) দুনিয়ার অস্তিত্বশীল সকল বস্তু এবং সমগ্র মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ ও শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল। এসবের পেছনে কারও চিন্তা বা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কাজ করছে না।

Second, Humanism, drawing especially upon the laws and fact of science, believes that we human beings are an evolutionary product of the Natural of which we are a part; that the mind is indivisibly conjoined with the functioning of

the brain; and that as an inseparable unity of body and personality we can have no conscious survival after death.

দ্বিতীয় : হিউম্যানিজম কেবল বৈজ্ঞানিক নীতিমালা ও বাস্তবতার ওপরই নির্ভরশীল। এর বিশ্বাস হলো, মানুষ এই বস্তুগত দুনিয়ারই একটি অংশ, যা প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছেছে। রুহ বা আত্মা মূলত মানুষের মনোজগৎ-সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের নাম, (অর্থাৎ রুহের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং এটা আকলের ক্রিয়াকলাপের নাম) যা আকল থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আর আত্মা ও দেহ যেহেতু আলাদা কিছু নয়, তাই মৃত্যুর পর অনুভূতিশীল কোনো জীবনের অস্তিত্ব নেই।

Third, Humanism, having its ultimate faith in humankind, believes that human beings possess the power or potentiality of solving their own problems, though reliance primarily upon reson and scientific method applied with courage and vision.

তৃতীয় : হিউম্যানিজম হলো 'মানুষ'-এর ওপর চূড়ান্ত বিশ্বাস স্থাপনের নাম। তাই মানবীয় যেকোনো সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান (ওহি ও আসমানি হেদায়েতের পরিবর্তে) মনুষ্য বিবেক ও বিজ্ঞানের মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে।

Fourth, Humanism, in opposition to all theories of universal determinism, fatalism, or predestination, believes that human beings, while conditioned by the past, possess genuine freedom

of creative choice and action, and arem within certain objective limits, the shapers of their own destiny.

চতুর্থ : হিউম্যানিজম পূর্বনির্ধারিত জ্ঞানতত্ত্বের (অর্থাৎ তাকদিরের) ধারণাকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করে এবং এই বিশ্বাস লালন করে যে, মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের স্রষ্টা। সে যেটাকে ইতিবাচক মনে করবে সেটা গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার আছে। (অর্থাৎ ধর্মীয় বা বহিরাগত কোনো বিধিনিষেধের অনুসরণ করা উচিত না।) কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণে মানুষ পূর্ণ স্বাধীন।

Fifth, Humanism believes in an ethics or morality that grounds all human valus in this-earthly experiences and relationships and that holds as its highest goal the this worldly happiness, freedom, anad progress—economic, cultural, and ethical—of all humankind, irrespective of nation, race, or religion.

পঞ্চম : হিউম্যানিজম এমন এক নৈতিকতায় বিশ্বাস করে, যা (ধর্ম, সমাজ, গোত্রীয় ঐতিহ্য ও শিক্ষার পরিবর্তে) কেবল মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব সুখ, সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা ও বস্তুগত উন্নতিই যার একমাত্র লক্ষ্য।[1]

এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এই দর্শন এবং এর দার্শনিকরা যখন মানুষকেই মহাবিশ্বের অক্ষ এবং ভালো-মন্দ

[1]. Humanism as a philosophy by Corliss Lamont p. 13-14, 8th edition, Humanist press 1997

নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি দিলো; তখন আল্লাহর ইবাদতের প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? এ কারণেই দেকার্ত (Descartes) বলেছে, 'এমন সত্তাকে কীভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়, যে কেবলই কাল্পনিক!?' আধুনিক সভ্যতার পয়গম্বর—ডেকার্ত, ভলতেয়ার, নীটশে, হেগেল, কান্টসহ এদের সকলের বক্তব্যের সারকথা হলো :

১. মানুষই মহাবিশ্বের অক্ষ এবং কেন্দ্র।

২. স্বাধীনতা তার আদর্শ (Ideal)।

৩. সমতা তার অধিকার।

৪. আর যৌক্তিকতা (Rationality) ভালো-মন্দ নির্ণয়ের মাপকাঠি।

হিউম্যানিটি মানবতা নয়

'হিউম্যানিটি'র অনুবাদ 'মানবতা' করা হয়, যা সঠিক নয়। মানবতার জন্য সঠিক ইংরেজি শব্দ হলো Mankind। অষ্টদশ শতাব্দীর পূর্বে এই শব্দটিই মানবীয় সমাজ বোঝানোর জন্য ব্যবহার হতো। বস্তুত হিউম্যানিটি হলো মানবতাকে প্রত্যাখ্যান করার নাম। এই হিসেবে হিউম্যানিটি অর্থ হলো 'শয়তানবাদ' বা 'আত্মপূজা'।

হিউম্যানিটির সঠিক মর্ম ও ব্যাখ্যা বিবৃত হয়েছে প্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের (Walt Whitman) ওই বিদ্রোহী রণসংগীতে, যা আমেরিকান দার্শনিক রিচার্ড রটি (Richard Rorty) তার সুপ্রিদ্ধ বই Achieving Our Country-তে (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৯৮ ইং) উদ্ধৃত করেছে :

'হে লোকসকল! আমার ডাকে সারা দাও,
আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো।

আমি তোমাদের খোদার দিকে ডাকছি না,
আমি তোমাদের খোদার ইবাদতের দিকেও ডাকছি না।
আমি তোমাদের আহ্বান করছি মানবতার দিকে,
তোমাদের আহ্বান করছি মানবতার উপাসনার প্রতি।
হে মানুষ সকল! আমার এই আহ্বানে সারা দাও,
আমার এই কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোনো।
লোক সকল! খোদার অনুসন্ধান ছেড়ে দাও, খোদার জন্য লড়াই ছেড়ে দাও,
কেননা যে নিজ সত্তার অনুসন্ধানে লেগে যায়, তার খোদার অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না।'

রিচার্ড রটি তার এই কিতাবের আরেক স্থানে আমেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যে লেখে, 'পূর্ববর্তী জাতি ও সভ্যতার লোকেরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে; কিন্তু জন ডিউই (John Dewey) ও হেগেল (Hegel) পশ্চিমা জনগণকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের এই অনর্থক চেষ্টা থেকে বের করে এনেছে এবং এই শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে যে, সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করা উচিত শুধুই মানুষের সন্তুষ্টি ও কামনাবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে।'

সুনির্দিষ্ট এই জ্ঞান-দর্শনকেই বলা হয় হিউম্যানিজম, আর তার বাহককে বলা হয় হিউম্যান বিয়িং (Human Being)। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে, চাই তা সাইন্স হোক বা সোশ্যাল সাইন্স, সবগুলোর পেছনেই এই দর্শন ক্রিয়াশীল।

এখানে একটি বিষয় বোঝা খুব প্রয়োজন, যেকোনো জীবনব্যবস্থা মানুষকে কীভাবে পরিচালনা করবে তা অনেকটা নির্ভর করে ওই জীবনব্যবস্থা মানুষকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে তার ওপর। ইসলাম মানুষকে সংজ্ঞায়িত করে আবদ বা আল্লাহর গোলাম হিসেবে এবং এর আলোকেই মানুষের পুরো জীবনব্যবস্থা সাজিয়ে তোলে। আর পশ্চিমা সভ্যতা মানুষকে সংজ্ঞায়িত করে হিউম্যান বিয়িং—এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, যার জীবন পরিচালনার জন্য কোনো ঐশী সত্তার প্রয়োজন নেই—হিসেবে এবং এর আলোকেই মানবীয় জীবনের সকল বিষয় সাজিয়ে তোলে। হিউম্যানিজমের দর্শন ইসলামের আবদিয়্যাতের দর্শনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। কেননা একজন আবদ বা গোলাম নিজ খেয়াল-খুশির অনুসারী হয় না, বরং তার মালিকের খেয়াল-খুশির অনুসারী হয়; সে নিজেই নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের মাপকাঠি নির্ধারক নয়, বরং ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত কল্যাণ ও অকল্যাণকেই সে নিজের জীবনের জন্য বেছে নেয়।

পশ্চিমা দার্শনিকদের কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই যে, কেন মানুষকে এই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে, আর মৃত্যুর পরেই-বা মানুষের কী হবে? বরং এই ধরনের প্রশ্নকে তারা অনর্থক মনে করে। কেননা তারা মানুষকেই সবকিছুর মূল, আর তার বসবাসের এই দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধিকেই আলোচনার একমাত্র বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। এ জন্য তারা মানবীয় সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল শক্তি করায়ত্ত করার পেছনে এবং দুনিয়াকে জান্নাতে পরিণত করার পেছনে ব্যয় করে। এটাই তাদের নিকট সফলতার একমাত্র মাপকাঠি। এ ছাড়া অন্য সকল মাপকাঠি তাদের কাছে অনর্থক। এই দর্শনের ওপরই স্থাপন করা

হয়েছে হিউম্যান রাইটস চার্টার বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, যার আবশ্যকীয় তিনটি উপাদান হলো :

১. স্বাধীনতা, যা আবদিয়্যাতের দর্শনকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। একে আমরা ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষার সাথে বিদ্রোহ বলে মনে করি।

২. সমতা, যার মর্ম হলো, ইমান-কুফর, হক-বাতিল, ভালো-মন্দ সব বরাবর। এই দর্শন আল্লাহর হেদায়েতের ধারণাকে সুস্পষ্টরূপে নাকচ করে দেয়।

৩. উন্নতি, যাকে আরেক শব্দে ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উল্লাস, অঢেল সম্পদের স্তূপীকরণ বলে ব্যক্ত করা যায়।[2]

হিউম্যানিজম ও আখলাখ :

কোন জিনিষটা আখলাক আর কোন জিনিষটা বদ আখলাক, কোনটা নৈতিক আর কোন কোনটা অনৈতিক এটা আমরা নির্ধারণ করি কীভাবে? ইসলামের বিশ্বাস হলো, ওহীই হলো মূল উৎস এটার জানার যে, কোনটা আখলাকি বা নৈতিক আর কোনটা বদআখলাকি বা অনৈতিক।

হিউম্যানিজম মতবাদটি মানবজাতীর উপর অন্যতম যে আঘাতটি করেছে, তা হলো আখলাক বা নৈতিকতা ও অনৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে মানুষের অভিজ্ঞতাকে। সময়ে সময়ে অভিজ্ঞতার আলোকেই মানুষ তার জন্য আখলাক ও মোরালেটি ঠিক করবে। এর

---

[2]. 'স্বাধীনতা', 'সমতা' ও 'উন্নিতি' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. যাহেদ সিদ্দিক মোঘল রচিত 'ইসলামি ব্যাংকারি ও জমহুরিয়্যাত : ফিকরি পাস মানজার আওর তানকিদি জায়েযা' পৃষ্ঠা : ১৮০-১৯৫; মাওলানা ইফতেখার সিফাত রচিত 'হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব', নাশাত প্রকাশন থেকে প্রকাশিত।

বাহিরে ধর্ম বা সমাজ মানুষের জন্য নৈতিকতা নির্ধারণ করতে পারবে না।

হিউম্যান মেনোফেষ্টোতে বলে হয়েছে,

THIRD: We affirm that moral values derive their source from human experience. Ethics is autonomous and situational needing no theological or ideological sanction. Ethics stems from human need and interest. To deny this distorts the whole basis of life. Human life has meaning because we create and develop our futures. Happiness and the creative realization of human needs and desires, individually and in shared enjoyment, are continuous themes of humanism. We strive for the good life, here and now. The goal is to pursue life's enrichment despite debasing forces of vulgarization, commercialization, and dehumanization.

তৃতীয়ত: আমরা বলি যে, মানুষের অভিজ্ঞতা থেকেই নৈতিক মূল্যবোধ উৎসরিত হয়। নৈতিকতা একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং তা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। **নৈতিকতার জন্য কোনো ধর্মীয় বা আদর্শিক অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।** মানুষের প্রয়োজন এবং স্বার্থ থেকেই নৈতিকতার সৃষ্টি। এটি অস্বীকার করলে মানবজীবনের সম্পূর্ণ ভিত্তিকেই বিকৃত করা হয়। আমরা নিজেদের ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করি, একে গড়ে তুলি-এজন্যেই মানুষের জীবন অর্থবহ হয়। মানবতার মূল থিমটাই হচ্ছে সুখ এবং মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিশীল বাস্তবায়ন, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উপভোগ্যতা। আমরা এখন, এখানে

একটি ভালো জীবনযাপনের জন্যে চেষ্টা করছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করা এবং একই সাথে অশ্লীলতা, বাণিজ্যিকীকরণ ও অমানবিক নানা শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা।[3]

নৈতিকতা নির্ধারণে মাপকাঠি মানুষকে দিয়ে দেওয়ার ফলে আজ পুরো পৃথিবী নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট কাজকে নৈতিক নামে দেখতে পাচ্ছে। কাল যেটা অনৈতিক ছিলো আজ সেটাই নৈতিক হয়ে যাচ্ছে। গতকাল পর্যান্ত যেটা নিকৃষ্ট কাজ ছিলো আজ সেটা মানব অধিকারে রূপ নিচ্ছে, এভাবে পশ্চিমা সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হচ্ছে এবং পুরো পৃথিবীকে পশুর সমাজে পরিবর্তন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পশ্চিমা সমাজে নষ্টামির যে বিবরণ আমরা শুনি তা মূলত এভাবেই আইন হয়ে বৈধতার রূপ নেয় এবং ধীরে ধীরে পুরো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবাধিকার চার্টার ও তার লেখক

হিউম্যানিজমকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া অসংখ্য দার্শনিক, বিদ্যান ও ধনবানের নাম নেওয়া যাবে, যাদের সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার বদৌলতেই ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ধর্মদ্রোহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফ্রান্সের স্বাধীনতা আর আমেরিকার স্বাধীনতার মাঝে রয়েছে গভীর সামঞ্জস্য। এদের স্বাধীনতার অর্থ কেবল ভিনদেশের আগ্রাসন থেকে স্বাধীনতা নয়; বরং ধর্ম, পাদরি, ধর্মীয় গ্রন্থ এবং নীতি-নৈতিকতার সকল সীমারেখা থেকে স্বাধীনতা।

১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা সামনে আসে। তারপর ১৭৮৮ সনে আমেরিকার সংবিধানে 'বিল অব রাইটস' (অধিকার আইন)

3

যুক্ত করা হয়, যার উৎস হলো ফেডারেলিস্ট পেপারস। আর ফেডারেলিস্ট পেপারস হলো ওই সকল প্রবন্ধ, যেগুলো আমেরিকার সংবিধানকে রক্ষার জন্য আমেরিকার প্রথম অর্থমন্ত্রী আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, আমেরিকার প্রথম প্রধান বিচারপতি জন জে এবং রাষ্ট্রপতি জেমস ম্যাডিসন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছে। এসব প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে রেনেসাঁ, রিফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের মুলহিদ ও খোদাদ্রোহী দার্শনিকদের চিন্তাধারার আলোকে। জাতিসংঘের প্রচারিত ঘোষণাপত্র The Universal Declaration of Human Rights (যার অনুবাদ করা হয় 'মানবাধিকার') বিল অফ রাইটসেরই চর্বিতচর্বণ। মানবাধিকারের এই ঘোষণাপত্রের লেখিকা হলো ওই সময়ের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের স্ত্রী এলেনর রুজভেল্ট।

হিউম্যান রাইটস বাস্তবায়নের জন্য বৈশ্বিক শক্তিধরদের চাপপ্রয়োগ

জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলো হিউম্যান রাইটসকে সর্বজনীন, বৈশ্বিক ও সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে বলে মেনে নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করতে এক প্রকার বাধ্য। মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলো যখন জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে, তখন তারাও এই কথার স্বীকৃতি দিয়েই সদস্যপদ অর্জন করেছে। সদস্যপদ প্রাপ্ত কোনো দেশেরই এই অধিকার নেই যে, সে হিউম্যান রাইটসকে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক কোনো আইন তৈরি করবে। এমনকি দেশীয় আইন প্রণয়নেও হিউম্যান রাইটসের নিয়মাবলির প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক।[4]

---

[4]. প্রসঙ্গত এখানে জাতিসংঘ সিস্টেম (UN System) নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। জাতিসংঘ সিস্টেম মূলত বিশ্ব পরিচালনার এমন এক সিস্টেম, যা পৃথিবীর সবকিছু

নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমে এই সিস্টেমের নাম ছিলো লিগ অফ নেশনস। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা নিজ হাতে এটার নেতৃত্ব তুলে নেয় এবং নাম দেওয়া হয় 'বন্ধুদের জোট' বা 'মিত্রদের জোট'। এটাকে তখন ব্যবহার করা হয় বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সাহায্যের জন্য। পরবর্তীতে এটার প্রসার ঘটানো হয় এবং সর্বজনীন একটা সিস্টেমে রূপান্তর করা হয়, যার নাম দেওয়া হয় জাতিসংঘ। তারপর প্রত্যেকটা সেক্টরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার অধীনে গড়ে তোলা হয় অর্গানাইজেশন, এজেন্সি, ফান্ড-সহ বিভিন্ন ধাঁচের আরও অসংখ্য সংগঠন। প্রথমে এগুলোকে মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করা হবে বলা হলেও সংকটকালে এসব সংগঠন 'বন্ধুদের' স্বার্থে কাজ করে বা করতে বাধ্য হয়। এ কারণেই গত ৭৫ বছর ধরে জাতিসংঘ প্রকৃতপক্ষে 'বন্ধুদের জোট' হিসেবেই কাজ করেছে। আর এর মাধ্যমে 'বন্ধুদের' স্বার্থ সমুন্নত রাখতে দেশে দেশে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিচে এই নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হলো। এগুলো সরাসরি জাতিসংঘের অধীন সংগঠন। এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতিসংঘের আর্থিক সমর্থনে গড়ে তোলা হয়েছে শত শত এনজিও, সংস্থা, সংগঠন ও গ্রুপ, যেগুলো দেখতে স্থানীয় হলেও বাস্তবে কাজ করে থাকে আন্তর্জাতিক 'বন্ধু সংঘের' স্বার্থে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ : 1. UNFPA - United Nations Population Fund
2. United Nations sexual and reproductive health agency

স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ : 1. WHO - World Health Organization
2. UNAIDS

ঔষধ নিয়ন্ত্রণ : Interagency Pharmaceutical Coordination Group

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ : 1. FAO - Food and Agriculture Organization
2. WFA - World Food Association

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ : WMO - World Meteorological Organization

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ : 1. NPT - Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
2. UNODA - UN Office for Disarmament Affairs
3. Arms Trade Treaty
4. OPCW - Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
5. CTBTO - Preparatory Commission Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ : UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ : UN Habitat - United Nations Human Settlements Programme

অর্থ নিয়ন্ত্রণ : 1. IMF - International Monetary Fund
2. WORLD BANK

3. African Development Bank
4. Asian Development Bank
5. Caribbean Development Bank

অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ : UNDP - United Nations Development Programme

সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ : UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ : WTO - World Trade Organization

পর্যটন নিয়ন্ত্রণ : UNWTO - UN Tourism

টেলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ : ITU - International Telecommunication Union

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ : 1. ICC - International Criminal Court
2. IJC - International Court of Justice

শিশু নিয়ন্ত্রণ : UNICEF - United Nations Children's Fund

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ : UNDP - United Nations Development Programme

দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ : 1. UNCDF - UN Capital Development Fund
2. UNPDTF- United Nations Peace and Development Trust Fund

পানি নিয়ন্ত্রণ : UN-Water

নৌ যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ : 1. IMO - International Maritime Organization
2. UNCLOS - United Nations Law of the Sea Convention
3. ITLOS - International Tribunal for the Law of the Sea

পোস্টাল নিয়ন্ত্রণ : UPU - Universal Postal Union

শিল্প উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ : UNIDO - United Nations Industrial Development Organization

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ : WMO - World Meteorological Organization

মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ : UNOOSA - The United Nations Office for Outer Space Affairs

সরকার নিয়ন্ত্রণ : UNDEF - United Nations Democracy Fund

আকাশ যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ : ICAO - International Civil Aviation Organization (ICAO)

নারী নিয়ন্ত্রণ : 1. UN Women
2. IANWGE - Inter-Agency Network on Women and Gender Equality
3. UNiTE

কর্মী নিয়ন্ত্রণ : ILO - International Labor Organization

শরণার্থী নিয়ন্ত্রণ : UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

অভিবাসী নিয়ন্ত্রণ : IOM - International Organization for Migration

ইউএনডিপি (UNDP-United Nations Development Programme) কর্তৃক প্রণীত 'হিউম্যান ডেবলপ রিপোর্ট ২০০০'-এ হিউম্যান রাইটসের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে মৌলিক তিনটি ধারা উল্লেখ করা হয় :

এক. তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো দেশীয় আইনের ওপর আন্তর্জাতিক আইনকে প্রাধান্য দেবে, যা হিউম্যান রাইটসের সাথে সম্পৃক্ত অসামরিক বিষয়গুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

মানবাধিকার নিয়ন্ত্রণ : OHCHR - Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
ত্রাণ নিয়ন্ত্রণ : OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
কৃষি নিয়ন্ত্রণ : IFAD - International Fund for Agricultural Development
পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ : UNEP - UN Environment Programme
এইডস নিয়ন্ত্রণ : UNAIDS
মাদক এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণ : UNODC - UN Office on Drugs and Crime
আবাসন এবং শহর নিয়ন্ত্রণ : UN Habitat - United Nations Human Settlements Programme
কৃষি নিয়ন্ত্রণ : IFAD - International Fund for Agricultural Development
দুর্যোগ রিস্ক নিয়ন্ত্রণ : UNDRR - United Nations Office for Disaster Risk Reduction
মানবাধিকার নিয়ন্ত্রণ : HRW - Human Rights Watch
আইন নিয়ন্ত্রণ : International Law Commission
শান্তি নিয়ন্ত্রণ : UN Peacekeeping Mission
সাগরতল নিয়ন্ত্রণ : ISA - International Seabed Authority
আরও :

1. UNECE - United Nations Economic Commission for Europe
2. UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change
3. UNOPS - United Nations Office for Project Services
4. UN DESA United Nations Department of Economic and Social Affairs
5. UNGEI - United Nations Girls' Education Initiative

দুই. জাতিরাষ্ট্রগুলোর কাঠামো ওই সকল আন্তর্জাতিক আইন ও আদালতের অধীন করে দেওয়া হবে, যা তৈরি করা হয়েছিলো পুঁজিবাদকে বৈশ্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে।

তিন. সামাজিকভাবে এমন সংগঠন তৈরি করা হবে, যা অধিকারের রাজনীতিকে উন্নত করবে, জাতিরাষ্ট্রগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে; পাশাপাশি জনসমর্থন আদায় করবে।

জাতিসংঘের অধিভুক্ত ও পশ্চিমা বিশ্বে যত এনজিও রয়েছে, সেগুলোর মৌলিক একটি কাজ হলো এই বিষয়টি মনিটরিং করা যে, কোনো রাষ্ট্র হিউম্যান রাইটসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে না তো? জাতিসংঘের সপ্তম সিকিউরিটি জেনারেল কফি আনান একবার এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলো যে, যেসব রাষ্ট্র জাতিসংঘের নীতিবহির্ভূত কোনো আইন প্রণয়ন করবে, সেসব রাষ্ট্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক অভিযান চালাবে। তার বক্তব্য ছিল, কোনো রাষ্ট্রের এই অধিকার নেই যে, সে জাতিসংঘের আইন লঙ্ঘন করে নিজস্ব আইন তৈরি করবে।

কুরআন-সুন্নাহর দর্পণে হিউম্যানিজম

পশ্চিমা দর্শন শুধুই পার্থিব জগৎ নিয়ে আলোচনা করে। এই বিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো? সৃষ্টির পূর্বে মানুষ কোথায় ছিল? মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা হবে কি না? এসব প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনো উত্তর তার কাছে নেই। সৃষ্টি সম্পর্কে তারা বলে, মানুষ এমনি এমনি সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কীভাবে? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর তাদের কাছে

নেই। প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের (১৯৮০) বক্তব্য হলো, 'আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমরা জানি না। যেহেতু সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমরা জানি না, আর এই দুনিয়াতেই আমাদের বসবাস করতে হবে এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষ একসময় নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে; তাই কোনটা আমাদের জন্য কল্যাণ আর কোনটা অকল্যাণ, তার সর্বজনীন নৈতিক কোনো কাঠামো তৈরি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

এটা কেমন দর্শন, যেখানে মানুষের সৃষ্টি ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনাকে অনর্থক মনে করা হয়!? অথচ কুরআন পৃথিবী, মানব সৃষ্টি ও সৃষ্টির লক্ষ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ প্রশান্তিদায়ক জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কথাও একদম স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয়, যা আজ পর্যন্ত কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে।[5]

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

মানুষের ওপর কি কালের এমন কোনো মুহূর্ত এসেছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে এ উদ্দেশ্যে যে, তাকে পরীক্ষা করব।

[5] সুরা আলাক : ১-২

তার পর পর আমি তাকে বানিয়ে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।[6]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।[7]

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

আমি আদম-সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, তাদেরকে বাহন দিয়েছি স্থলে ও জলে, তাদেরকে রিজিকস্বরূপ পরিচ্ছন্ন দ্রব্যাদি দান করেছি।[8]

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি জিন ও মানুষকে শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে।[9]

وَ مَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

আর তোমাদের (মানুষদের) সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।[10]

وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا

আর মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।[11]

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

---

[6] সুরা দাহর : ১-২
[7] সুরা তিন : ৪
[8] সুরা বনি ইসরাইল : ৭০
[9] সুরা যারিয়াত : ৫৬
[10] সুরা বনি ইসরাইল : ৮৫
[11] সুরা নিসা : ২৮

মানুষ বড় বে-ইনসাফ, খুবই অকৃতজ্ঞ।[12]

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا

নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলচিত্তে।[13]

اَوَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাকে (সামান্য) শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? আর অমনি সে হয়ে উঠল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী।[14]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমের মধ্যে। সে কি মনে করে, তার ওপর কারও ক্ষমতা চলবে না?[15]

وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَه بِالْخَيْرِ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا

মানুষ অকল্যাণ পার্থনা করে, যেমন সে পার্থনা করে কল্যাণ; আর মানুষ হচ্ছে অতি ত্বরাপ্রবণ।[16]

وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا

আর মানুষ হচ্ছে অতি সংকীর্ণমনা।[17]

وَ كَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

---

[12] সুরা ইবরাহিম : ৩৪
[13] সুরা মাআরিজ : ১৯
[14] সুরা ইয়াসিন : ৭৭
[15] সুরা বালাদ : ৪-৫
[16] সুরা বনি ইসরাইল : ১১
[17] সুরা বনি ইসরাইল : ১০০

মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি কলহপ্রিয়।[18]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى

মানুষকে তিনি সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। কখনোই না, মানুষ তো অবাধ্য হয়ে যায়।[19]

তো, এই যদি হয় মানুষের গুণ যে, সে মূর্খ, দুর্বল, অকৃতজ্ঞ, ত্বরাপ্রবণ, স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী, কামনা-বাসনার ঘোড়ায় আরোহী, সত্য থেকে বিচ্যুত ইত্যাদি ইত্যাদি; তাহলে কীভাবে তার পক্ষে এমন সর্বজনীন নিয়ম তৈরি করা সম্ভব, যা সদা-সর্বদা কার্যকর থাকবে!? আজ যারা আসমানি ওহিকে বাদ দিয়ে নিজেদের প্রণীত আইন অনুসারে জীবন পরিচালনা করছে, তারা কোথায় পৌঁছেছে? তারা কি মানুষ থেকে পশু কিংবা আরও নিকৃষ্ট স্তরে চলে যায়নি? তাদের পরিবারব্যবস্থা কি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েনি? একদিকে সম্পদের পাহাড় আর অন্যদিকে না খেয়ে হাজারো লাখো মানুষ কি প্রতিনিয়ত মৃত্যুবরণ করছে না?

যেকোনো দর্শন ও মতবাদের সঠিক পরিচয় তার বিশ্বাসের মাঝে

* এটা নিশ্চিত যে, যেকোনো মতবাদকে চিনতে হলে তার পেছনের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে হয়। এ ছাড়া তার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বাসের গভীর প্রভাব বিদ্যমান থাকে। বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রভাব ও অশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রভাবের মাঝে আকাশ-

[18] সুরা কাহফ : ৫৪
[19] সুরা আলাক : ৫-৬

পাতাল ব্যবধান। বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস মানুষের জীবনকে অকল্পনীয় সুন্দর করে তোলে। তাওহিদ, রিসালত ও আখেরাত একজন মুমিনের ইমানের অন্যতম ভিত্তি, যা সদাসর্বদা অপরিবর্তনীয়। এগুলোর ওপর ইমান যত মজবুত হবে, কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তাও তত সুন্দর ও নির্মল হতে থাকবে। এ জন্যই ইসলামি সমাজে খোদাভীতি, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, সাহসিকতা, দুর্বলদের প্রতি দায়িত্বশীলতা ইত্যাদি গুণগুলো অনিবার্যভাবেই তৈরি হয়ে যায়।

এর বিপরীত যে সমাজগুলো মানবাধিকার ও হিউম্যান রাইটসকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং নিজেদের প্রণীত সংবিধানকে কুরআনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে, সেগুলো অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় কানায় কানায় পূর্ণ। অঢেল সম্পদ ও বিলাসিতার হাজারো উপকরণ থাকা সত্ত্বেও নেই নিরাপত্তা। অশ্লীলতার অবাধ সয়লাবে বিপন্ন লাখো-কোটি মানুষের জীবন। লোভ, হিংসা, আত্মসাৎ, জুলুম, খুন, রাহাজানি সে সকল সমাজের একটি অতিসাধারণ চিত্র। এর মৌলিক কারণ হলো, যখন মানুষ আল্লাহর গোলামি থেকে মুক্ত হতে চায় তখন অন্য কারও গোলামে পরিণত হয়—হয়তো নিজের নফসের বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সিস্টেমের। ফলে মানবশ্রেণির খোদা দাবিদাররা নিজেদের খোদায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়ে যায়। আর এতেই সমাজে ছড়িয়ে পড়ে বিশাল সব বিশৃঙ্খলা।

* কোনো মতবাদ বা চিন্তার শুদ্ধতা যাচাইয়ের আরেকটি অন্যতম পদ্ধতি হলো, তার ধারকবাহক কারা? কেমন তাদের ব্যক্তিচরিত্র? তাদের চিন্তা-বিশ্বাস কী? ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা। ইসলামের ধারক-বাহকদের জীবনী আর পশ্চিমা সভ্যতার ধারক-

বাহকদের জীবনী লক্ষ করলে আপনি দেখতে পাবেন, উভয়ের মাঝে কী আশ্চর্য পার্থক্য বিদ্যমান! ইসলামের ধারক-বাহকদের জীবনী কতটা পবিত্র আর নিষ্কলুষ। বিপরীতে পশ্চিমা সভ্যতার মূল দার্শনিকদের অধিকাংশেরই চরিত্রই নোংরামিতে ভরপুর ও নৈতিকতায় শূন্য। উদাহরণত, পশ্চিমা সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রুশো ছিলো নারীলোভী। ঘন ঘন বিবাহ-বহির্ভূত নারী বদলানো ছিলো তার স্বভাব।[20] তাহলে কীভাবে এদের তৈরি দর্শন ও জীবনব্যবস্থাকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মেনে নেব?

বান্দার অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হিউম্যান রাইটসের নির্দিষ্ট একটি দর্শন রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস ও প্রয়োগক্ষেত্র। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা পশ্চিমা পরিভাষাগুলোকে শুধু শাব্দিক মিলের কারণে ইতিহাস ও প্রয়োগক্ষেত্র না জেনেই ব্যবহার শুরু করি! অতঃপর আবার তার ইসলামি ব্যাখ্যাও করে থাকি! এর একটি বড় কারণ পরাজিত মানসিকতা, যা একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, পশ্চিমের সবকিছুই উন্নত ও বাস্তবসম্মত। এই পরাজিত মানসিকতার লোকেরা পশ্চিমা চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ ছোড়ার পরিবর্তে তাকে ইসলামি সমাজের উপযোগী করে পেশ করার চেষ্টা করে। এরই একটা ফল হলো ইসলামের 'হুকুকুল ইবাদ'-এর ধারণাকে মানবাধিকারের ধারণার সাথে গুলিয়ে ফেলা। আর একদল তো 'ইসলামই সর্বপ্রথম মানধিকার নিশ্চিত

[20]. আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, ড. আমীনুল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ২১১, মাওলা ব্রাদার্স, দ্বাদশ মুদ্রণ ২০১৯

করেছে', 'রাসুলের বিদায় হজের ভাষণই মানধিকারের প্রথম সবক' ইত্যাদি বলে নিজের পরাজিত মানসিকতার ঘোষণা দিয়ে থাকে!

মনে রাখতে হবে, 'মানবাধিকার' (হিউম্যান রাইটস) একটি নির্দিষ্ট চিন্তার মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা নিজের অবাধ স্বাধীনতার ওপর ইমান রাখে। এর একটি উদাহরণ হলো 'ট্রান্সজেন্ডার আইন'। কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারীতে রূপান্তর করতে চায় বা কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষে রূপান্তরিত করতে চায়; তাহলে এটা কেবল তার অধিকারই নয়; বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো আইনি প্রক্রিয়ায় হলেও ব্যক্তির এই অধিকার সংরক্ষণ করা। কেন? কারণ, এটা ব্যক্তির স্বাধীনতা; আর স্বাধীনতা রক্ষা না করার অর্থ হলো মানবাধিকার লঙ্ঘন! স্রষ্টা তাকে কীভাবে সৃষ্টি করেছে এবং কীভাবে থাকতে বলেছে, তা এখানে মুখ্য নয়, মুখ্য হলো প্রত্যেকে তার নিজের জন্য কী চাচ্ছে? স্রষ্টা পুরুষ বানিয়েছে, কিন্তু সে চাচ্ছে রাষ্ট্রের আইডিতে নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় দেবে, এখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তার এই 'অধিকার' রক্ষা করা। কারণ, এই অধিকার রক্ষার জন্যই রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে। আর এই অধিকারের পেছনে পশ্চিমের যে মূল বিশ্বাস তা হলো 'স্বাধীনতা'। এই স্বাধীনতা রক্ষাই হলো মানধিকার আইনের লক্ষ্য, যা হিউম্যান রাইটসের একদম প্রথম অনুচ্ছেদে এই শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে :

All human beings are born free...

সকল মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে...[21]

---

[21]. বিশিষ্ট্ ফকিহ ড. ফাদি মুসা পুরো বিষয়টি ব্যক্ত করেন এভাবে, 'পশ্চিমাদের কাছে স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণের অর্থ হলো, একজন মানুষ ধর্ম, ঈশ্বর ও দুনিয়ার মানুষের তৈরি যত

একজন মানুষ যখন নিজেকে 'আবদ' বা 'গোলাম' বলে স্বীকার করবে, তখন তার মাঝে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি হবে। আর যখন সে নিজেকে হিউম্যান বিয়িং মনে করবে, তখন কেবল নিজ স্বার্থরক্ষার প্রবণতাই তার মাঝে কাজ করবে। হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকারসমূহ আদায়ের প্রতি দায়িত্বশীলতা পরস্পরের মাঝে তৈরি করে সহানুভূতি, ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতার জজবা। আর মানবাধিকার তৈরি করে হিংসা, লোভ, আত্মসাতের মতো বিধ্বংসী রোগব্যাধি।

পশ্চিমা দার্শনিকদের তৈরি মানবাধিকারের এই ফ্রেমওয়ার্ক ব্যক্তি ও সমাজের হাতে 'অধিকার আদায়'-এর এক ধ্বংসশীল রাজনৈতিক অস্ত্র তুলে দিয়েছে, যা মানুষ ও সমাজকে লোভী, হিংসুক ও নিজস্ব চাহিদার গোলাম বানিয়ে দিয়েছে। অধিকার আদায়ের রাজনীতির অর্থই হলো অন্যের থেকে আমার অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। তাইতো এই উদ্দেশ্য অর্জনে তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য সংগঠন ও পার্টি। এই পার্টিগুলো দেশভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক, কখনো ধর্মভিত্তিকও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এদের প্রত্যেকের কাছেই আবার অধিকারের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মর্ম। আর প্রত্যেকেই নিজের অধিকার আদায়ের জন্য যেকোনো কিছু করতে তৈরি থাকে, চাই এতে অন্যের কী হলো, সমাজ ও রাষ্ট্রের কী লাভ-ক্ষতি হলো, এতে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। যেমন : নারীরা মনে করে তাদের অধিকারও পুরুষদের মতো হওয়া দরকার, তাই তারা এই লক্ষ্যে আন্দোলন করে যায়। শ্রমিকরা শ্রমিক ইউনিয়ন

বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা থেকে স্বাধীন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষার্থেই রাষ্ট্রের গঠন।' দেখুন, মাদারিকুত তাকফির, পৃষ্ঠা : ৭৪২, দারুল ফাতহ, প্রথম প্রকাশ ২০২১

তৈরি করে নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য, যেন নিজেদের মনমতো পারিশ্রমিক অর্জন করতে পারে। জাতীয়তাবাদীরা জাতীয়তার নামে পার্টি করে নিজেদের স্বার্থের জন্য। এভাবে সমাজের পুরো কাঠামোই তৈরি হয় স্বার্থবাদিতার ওপর। তাই প্রচার ও প্রচারণার মাধ্যমে যতই পরোপকারের সবক দেওয়া হোক না কেন, তাতে সমাজের সামান্যতম লাভও হয় না। সমাজ ও ব্যক্তি নিজ স্বার্থের পেছনেই ছুটতে থাকে। কখনো কখনো তো সেসব প্রচার-প্রচারণাও হয় আরেক স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার!

মোটকথা, যেসকল বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর হিউম্যানিজম প্রতিষ্ঠিত, তার বিশ্লেষণ থেকে আমরা নিশ্চয়তার সাথেই এই কথা বলতে পারি যে, হিউম্যানিজম একটি নিরেট কুফরি ও ইলহাদি মতবাদ। বরং এটা মানবেতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কুফরি মতবাদ। খোদাদ্রোহিতার সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ এই মানবতাবাদ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

> আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে জেনেশুনে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন ও তার চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতঃপর আল্লাহর পর কে তাকে সৎপথে আনবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা করো না? তারা

> বলে, 'জীবন বলতে আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটাই। আমরা মরি ও বাঁচি এবং কালই আমাদের মৃত্যু ঘটায়।' বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। সবটাই ওদের অনুমান।[22]

আজ মুসলিম সমাজে ও সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যত নাস্তিকতা ও কুফরির সয়লাব ঘটেছে ও ঘটছে, তার মূলে যে দর্শন কাজ করছে তা হলো হিউম্যানিজম। বর্তমানে এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যারা দীনের শিক্ষা বাদ দিয়ে এই মানবাধিকারের শিক্ষাকে গ্রহণ করে, তাঁদের অবস্থা ধীরে ধীরে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট হতে থাকে। শুরুটা হয় সন্দেহ-সংশয় দিয়ে, আর শেষ হয় হিউম্যান বিয়িংয়ের ওপর ইমান এনে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ভয়ংকর ফেতনা বোঝার এবং তার থেকে নিজেকে ও সমাজকে রক্ষা করার তাওফিক দান করুন! আমিন।[23]

---

[22] সুরা জাসিয়া : ২৩-২৪

[23]. মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ হাফেজ রচিত 'হিউম্যানিজম আওর হিউম্যান রাইটস : মুলহিদানা আফকার কা এক তায়েরানা মুতালাআ' প্রবন্ধটি থেকে যৎসামান্য সংযোজন-বিয়োজন করে উপর্যুক্ত লেখাটি তৈরি করা হয়েছে। পাকিস্তানের বিখ্যাত ও সর্বজনস্বীকৃত জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বানুরি টাউনের মুখপাত্র 'মাহনামায়ে বাইয়িনাত'-এর রজব ১৪৪৫ হি. সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।